***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 400–408*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848 (Online)*

# সৃষ্টির কলমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চন্দ্রাণী হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : chandulaxmi1993@gmail.com

## Keyword
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপনা, সাহিত্য, সৃষ্টি, উপন্যাস, ছোটোগল্প, কিশোর সাহিত্য, জার্নাল, মন্বন্তর, দেশভাগ

## Abstract
উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা- সর্বক্ষেত্রে পারদর্শী এমন লেখণীধর বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাতিঘর স্বরূপ সম্মুখে রেখে যে স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যস্রষ্টা এই দুস্তর সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই অপূর্ব রূপবান, সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মী রাজকীয় ভঙ্গিমায় বাংলা সাহিত্য থেকে বিশ্বসাহিত্যে অবলীলায় বিচরণ করতেন। শিল্পীর সুষমা কথনের বয়ানে, অনায়াস পদ-বিক্ষেপে, কুশলী পরিমিতিবোধে। আবেগ তারল্য যেমন নয়, গুরুভাব গাম্ভীর্যও তেমন নয়, বাঞ্ছনীয় প্রকৃত কলাসাধনায়। আবার ইতিহাস ও সাহিত্যের সুগভীর পাঠ-প্রতিক্রিয়া বক্তব্য ও লেখণীকে কতটা সরস, মায়াবী ও চারুত্বে ভরিয়ে তুলতে পারে তারও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি। অসামান্য স্মৃতিধর, একথা তো বলাই বাহুল্য।

বর্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত এক পরিবারে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে। স্বদেশ-স্বাধীনতা ও সাহিত্যসাধনা সেই বালক বয়সেই উদ্দীপ্ত করেছিল ভবিষ্যতের কথাশিল্পী, 'কথাকোবিদ' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। পূর্ববঙ্গের বরিশালে আদি নিবাস হলেও বাবার চাকরি সূত্রে দিনাজপুরে তাঁর অনেকটা সময় কেটেছে। বাবা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পুলিশের দারোগা, তবু তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। পড়াশোনার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। বইপড়া ছাড়া অন্য কোনো নেশা তাঁর ছিল না। কিশোর নারায়ণের সাহিত্য প্রেরণার উৎস তিনিই। অতি সংগোপনে বাগান বাড়ির চিলেকোঠায় পাকা কাঁঠালের গন্ধে রসসিক্ত আবহাওয়ায় তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। সেই অল্প বয়সেই কল্পনাশক্তির আশ্চর্য বিকাশে মোহময় নেশার বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েন। 'চিত্র-বৈচিত্র্য' নামে হাতে লেখা পত্রিকার লেখক, সম্পাদক, পাঠক সমস্তই এক নিঃসঙ্গ বালক। তবে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করতেন না পরিণত অধ্যাপক। বহু ছাত্রের বৃত্তে আপন ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা নিয়েও মিশে থাকতেই ভালোবাসতেন। কিন্তু লেখকের যে ভিন্নতর নিজের জগৎ চাই-ই চাই। সেই আপন জগৎ-বৃত্তে ডুবে থাকার অভ্যাস এত অল্প বয়সে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই পরিণত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রদের ভিড়ে সহকর্মী, কবি, শিল্পী, অভিনেতা, লেখকদের আতিথেয়তা অনুরোধ রক্ষা করেও অনায়াসে বাকদেবীর সাধনায় স্বচ্ছন্দ থেকেছেন। মাত্র তিপ্পান্ন বছরের জীবনে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, সাহিত্য

থেকে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে সমানভাবে অংশ নিয়েও সমসাময়িক যেকোনো লেখকের সঙ্গে সমান তালে লিখে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁকে 'সব্যসাচী' আখ্যায় অনায়াসে ভূষিত করা যায়। তাঁর নিপুন তুলির টানে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় চিত্রিত হয়েছে নানা স্বাদের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটক। শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে তো বটেই, পাশাপাশি অধ্যাপনার জগতেও তাঁর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কিছু কম নয়। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিক এই সু-বাগ্মী ব্যক্তিত্বকে কুর্নিশ না জানিয়ে পারেন নি। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিল সমকালীন ছাত্রমহল থেকে পাঠকমহল। কিন্তু হঠাৎই এই প্রতিভা থমকে দাঁড়ায় ১৯৭০ সালে। সাহিত্যাকাশ থেকে অকালে ঝরে যায় জ্যোতিষ্করূপী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

## Discussion

### ১

আদর্শগত ভিত্তি অখণ্ড জীবনদর্শন ছাড়া সুসাহিত্যিক হওয়া যায় না। স্বাদেশিকতার একটা আদর্শ পরাধীন দেশের কথাকার মাত্রই পেয়েছেন। বিশেষত রাজনৈতিকতা দিয়ে যাঁরা জীবন শুরু করে সাহিত্যিক হয়েছেন। এ ব্যাপারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। কারাবন্দী তারাশঙ্কর জেলে বসেই স্থির করেছিলেন সাহিত্যিক হবেন; হয়েওছেন, কিন্তু স্বদেশ ভাবনা ও স্বদেশি আদর্শের বাহক হয়ে থেকেছেন তাঁর নায়কেরা। শুধু গান্ধীবাদ নয়, 'কালিন্দী'র অহীন্দ্র মার্কসবাদের দীক্ষাও নিয়েছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই একই স্বাদেশিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। মেজদা শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের অনমনীয় দৃঢ়তা, স্বাধীনতা সংগ্রামে লৌহকঠোর বিপ্লবী মনোভাব কৈশোর-যৌবনের তারকনাথকে অনুশীলন সমিতির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। কারাবরণ, অন্তরীণ তাঁর আদর্শ ও স্বাদেশিকতাকে আরো গভীর করেছে। 'কালিন্দী'র অহীন্দ্রের মতোই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একে একে যুক্ত হয়েছে দারিদ্র্যতায় আচ্ছন্ন দেশবাসীর সকরুণ জীবনাভিজ্ঞতা; দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী, দেশভাগের ঘটনা, শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব।

নাতসিবাদ-ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে লেখক-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মকে হাতিয়ার করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছেন। কোনো সৎ শিল্পী মানবিক সভ্যতার রক্তক্ষরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, এমনকি বিভূতিভূষণের মতো আত্মমগ্ন শিল্পীও অশনিসংকেতের আতঙ্কে ভুগেছেন। তরুণ অধ্যাপক লেখক নারায়ণও সংগত কারণেই তাঁর স্বদেশ ভাবনার আদর্শের সঙ্গে মার্কসবাদের সমীকরণ ঘটিয়ে ফেলেছেন অবলীলায়। তিনি সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছেন ফরাসি বিপ্লবের প্রলয় থেকে জন্ম নেওয়া রোমান্সের ফিনিক্স পাখি মুখ থুবড়ে পড়েছে বাস্তবের মাটিতে। লেখক নারায়ণ অধ্যাপনার জগতে এসে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে দাঁড়ালেও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পালাবদল তাঁর সাহিত্যাদর্শকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। ঔপনিবেশিকতা-পরাধীনতা থেকে জন্ম নেওয়া স্বদেশ ও স্বাদেশিকতা নারায়ণবাবুর প্রায় প্রতিটি লেখার শরীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর মার্কসীয় ভাবনায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মানিক উত্তর পর্বের বাস্তববাদের দৃঢ় ভিত্তিতে। আবার নাগরিক মধ্যবিত্ত মনের সংকীর্ণতা, বিপ্লববাদের দ্বারা মধ্যবিত্তের মানসিক পরিধির বিস্তারের পক্ষপাতিও ছিলেন তিনি। মোটকথা লেখালেখি, অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে মার্কসীয় দর্শন ও বামপন্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে পারেন নি। কখনো তা চানও নি। কারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পার্টি কিংবা ক্লাসের বক্তব্য রেখেছেন। তবে কখনোই তা তাঁর জীবনদর্শনের পরিপন্থী কোনো অবস্থানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে নয়।

বরিশালের বি.এম.স্কুল ও বি.এম.কলেজে নারায়ণের পড়াশোনার সূচনা। ১৯৪১ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করেন। পরে বাংলা ছোটোগল্প বিষয়ে গবেষণা করে ডি.ফিল ডিগ্রিও লাভ করেন। এম.এ পাশ করে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে শিক্ষকতা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গ থেকে চলে এলেন কলকাতার সিটি

কলেজের চাকরি নিয়ে। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ছোটোবেলা থেকেই নারায়ণবাবুর লেখার বৈচিত্র্য ছিল। 'মাস-পয়লা'-য় কবিতা লেখা দিয়ে আত্মপ্রকাশ ছাত্রাবস্থাতেই, ছাত্রাবস্থাতেই 'গুরুদক্ষিনা' নাটক লিখে মঞ্চে উপস্থাপনায় ভূমিকা নিয়েছেন। সেভাবেই স্বদেশি আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অন্তরীণ হয়ে থেকেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া এবং পাশাপাশি ধারাবাহিক ভাবে 'দেশ', 'বিচিত্রা' ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা, গল্প লিখে চলা বিস্ময়করতা তো বটেই। কলকাতায় পা দিয়েই অর্থোপার্জনের জন্য তিন-তিনটে রোমাঞ্চকর আখ্যান লিখে ফেলা তাঁর সৃজনী শক্তির দক্ষতার পরিচয় দেয়। লেখার জগৎকে সমৃদ্ধ করতেই দেশি-বিদেশি সাহিত্য, ইতিহাসের আত্মমগ্ন সাধক হয়ে পড়েন।

## ২

কবি সাহিত্যিক মাত্রেই একটি প্রতিশ্রুতি থাকে এবং তা হল তাঁর স্ব-কাল, স্ব-সমাজ ও জীবন পরিবেশের মধ্যে আত্মস্থ থেকে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেকে অন্বেষণ, উপস্থাপন ও নির্মান করা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, স্ব-কাল তাঁকে স্পর্শ করেছে, আলোড়িত করেছে, কিন্তু উদ্ভ্রান্ত বা ধর্মচ্যুত করে নি। কাজেই ব্যক্তি-সত্তার গভীর দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করাকেই তিনি শিল্প ও সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের (সপ্তম সংস্করণ) বিংশ অধ্যায়ে 'রোমান্সধর্মী উপন্যাস- দ্বিতীয় স্তর' শীর্ষক আলোচনায় অগ্রজ লেখক মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে তরুণ লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করে লিখেছেন-

> "ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্য জাতির সঙ্গে তুলনায় বাঙালির রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রন সুপ্ত আছে। মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনো অতর্কিতভাবে তাহার রক্তে দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরেখা কোনো কোনো মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া ওঠে। বাঙালি জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশে আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠতম।"[১]

ছাত্র জীবনে কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের সূচনা হলেও চল্লিশ দশকের প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'উপনিবেশ' ১ম পর্ব (১৯৪৩) প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা রসিক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি তিনিটি খণ্ডে প্রকাশ পেলে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তিনি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হন। প্রথম উপন্যাস হলেও এর মধ্য দিয়েই লেখকের জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা নতুন দ্বীপ চর ইসমাইলের মানুষগুলির জীবন সংগ্রাম, তাদের প্রেম-ভালোবাসাও হিংসার যে জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন, তা লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি শক্তির পরিচয়ই শুধু দেয় নি, ভবিষৎ পরিণতির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তাই দেখা যায়, 'উপনিবেশ'-এর চর ইসমাইলের আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত জীবন থেকে তিনি আধুনিক জীবনের আঙিনায় এসে উপনীত হয়েছেন। বিষয়ের নবীনতায়, উপস্থাপনায়, ইতিহাস চেতনায়, জীবনবোধে 'উপনিবেশ' বিশেষ সৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান আর মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত মফস্বল শহর বারবার তাঁর লেখায় এসেছে। আর এসেছে কলকাতার নাগরিক জীবন, যা বিচিত্র, জটিল, রক্তাক্ত। 'শিলালিপি', 'মন্দ্রমুখর', 'মহানন্দা', 'লালমাটি' উত্তরবঙ্গের পটভূমে লেখা উপন্যাস। 'পদসঞ্চার' ভারতে ভাস্কো-ডা-গামার পদার্পণের পটভূমিতে রচিত। দেশ বিভাগ ও ছিন্নমূল মানুষের জীবন নিয়ে লেখা 'বিদিশা'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে অভিনব ভাবে লেখা 'অমাবস্যার গান'। তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসগুলিকে ('সন্ধ্যার সুর', 'নির্জন শিখর', 'আলোকপর্ণা' প্রভৃতি) সমালোচকগণ বলেছেন কিছুটা আত্ম-উদ্ঘাটন বা স্বীকারোক্তিমূলক। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে বলেছেন-

> "শেষ দিকের উপন্যাস আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের রীতিতে লেখা- চরিত্রের আত্মানুসন্ধানই মুখ্য। ...ব্যক্তির অসহায়তা ও পরাজয়ের বেদনা এইসব স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে।"[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে আঙ্গিক সচেতন লেখক তাও পাঠক জেনেছেন সেই প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস থেকেই। এ বিষয়ে অলোক রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য-

> "মুখ্যত কবি, এবং সেই সঙ্গে গল্পকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যকার পরিচয়ের কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না। তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করলে তাই সেখানে চোখে পড়ে এক ধরণের মিশ্র শিল্পের নিদর্শন। উপন্যাসের শিল্পরূপ, অবশ্য কখনই কোনও ধরাবাঁধা আদর্শ অনুসরণ করে নি। মহাকাব্যের উত্তরাধিকার বহন করে উপন্যাস তাই তখনও এপিকধর্মী, যেমন উপনিবেশ বা পদসঞ্চার। সেখানে শুধু পটভূমির বিস্তার নয়,পটধৃত চরিত্রের অসামান্যতাও লক্ষণীয়। ...সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খুরধার, ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ' গল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গল্পের মালা গেঁথে তিনি উপন্যাসও লিখেছেন, যেমন রোমান্স, যাকে তিনি বলেছেন 'গল্পোপন্যাস'। কিন্তু ঝোঁক সম্ভবত নাট্যোপন্যাসের দিকে- নিশিযাপন উপন্যাসে তাই কাহিনীর সূচনায় দেখি নাটকের মতো চরিত্রলিপি, বা পাতাল কন্যার আরম্ভ হয় ডক্টর সুবন্ধু মৌলিকের জীবনের পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে। তবে একাঙ্ক মালার মতো একাধিক ছোট কাহিনীকে একত্রে পরিবেশনের ইচ্ছা থেকে সাগরিকের জন্ম হয়।"[৩]

## ৩

উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটোগল্প রচনাতেও ঈর্ষণীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটোগল্পে তাঁর চকিত চমক এবং সংবেদনশীল মনের ছোঁয়া রসজ্ঞ পাঠকের মনে অনুরণন জাগায়। তাঁর গল্পের পরিবেশ ও পটভূমি শুধু বিচিত্রই নয়, বিস্তারও অপার। কি নেই তাঁর গল্পে! সমকালীন সময় ও জীবন তথা বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনা, রাজনীতি, কালোবাজারি, আঞ্চলিকতা, প্রকৃতি-প্রেম-রোমান্স, একাল-সেকালের দ্বন্দ্ব, সমাজবাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিকতা, মূল্যবোধ ও তার সংকট, অতিপ্রাকৃত ও পুরাণ প্রসঙ্গ, ঐতিহ্য ও আদর্শবোধ, নানা শ্রেণির মানুষ ও তাদের ইতিহাস, শ্রেণি বৈষম্য ও শোষণ ইত্যাদি তাঁর ছোটোগল্পে জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের পটভূমিতে মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের অশান্ত দিনগুলির পটভূমিতে নারায়ণ গল্প লেখা শুরু করেন। স্বভাবতই ১৯৪২-৪৫ এর বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ সেদিন লেখকের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত', 'পুষ্করা', 'ভাঙা চশমা', 'হাড়' ইত্যাদি গল্পে তার পরিচয় আছে। অধ্যাপক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন-

> "সাইরেনের তীব্র আর্তনাদ, ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ তিনি শুনেছেন, সেই সঙ্গে শুনেছেন সংরাম-শপথ-বাণী- 'আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিত কামান।"[৪]

দেশবিভাগের বেদনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে 'তিতির' ও 'সীমান্ত' গল্পে। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'বাইশে শ্রাবণ', 'শ্বেতকমল', এবং 'শুভক্ষণ' উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেছেন 'নতুন গান' গল্পটি। তেভাগা-তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'বন্দুক' গল্পটি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিত ফুটে উঠেছে 'ইজ্জৎ' গল্পে। শোষণ ও শ্রেণি বৈষম্যের রূপ ধরা পড়েছে 'তৃণ', 'তীর্থযাত্রা', 'ভোগবতী', 'ডিম', 'বীতংস' প্রভৃতি গল্পে। তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন গল্পেও রোমান্টিক ছায়াপাত হয়েছে- 'বনজ্যোৎস্না' আর ;জান্তব' তার প্রমান। মানবমনের জটিলতা, কুটিলতা তথা মানব-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটেছে 'একজিবিশন', 'আত্মহত্যা', 'বনতুলসী' প্রভৃতি গল্পে। দাম্পত্য জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্টিক বর্জিত, ভাবালুতামুক্ত, নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এই দৃষ্টিটাই আধুনিক। 'কাণ্ডারী' গল্পে লেখক জীবনের অনাবৃত রূপ দেখিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ধীরে ধীরে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে এই দৃষ্টির নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর

পাশাপাশি রয়েছে বীভৎস বাস্তবধর্মী গল্প, যা পাঠককে বিস্ময় আর উৎকণ্ঠার চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ করে- 'টোপ' গল্পটি যার সার্থক উদাহরণ। আবার প্রতিবাদী রাজনীতির গর্জন, ক্ষোভ আর কাতরতার কণ্ঠস্বর যে চিরকালই এক- এই সত্যটি ধরা আছে 'রেকর্ড' গল্পে।

বিষয় বৈচিত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে প্রায় অফুরন্ত ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে তাঁর মতো বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির দৃষ্টান্তও তিরিশোত্তর বাংলা ছোটোগল্পে খুবই কম। গভীর জীবনাভিজ্ঞতা, জীবন বোধ, ব্যক্তিত্ব, সময়-বাস্তবতাই তাঁর গল্পের চরিত্রায়ণের মূল ভিত্তি। চা-শ্রমিক, কুলি, মহাজন, আড়তদার, কাপড়ের ব্যবসায়ী, এস্টেটের মালিক, সেতার শিল্পী, পাদ্রী, বনবালিকা, মন্বন্তর পীড়িত, ঐতিহাসিক ইত্যাদি কত বিচিত্র ধরণের চরিত্রই না উঠে এসেছে গল্পে। চরিত্রের আত্ম-উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক প্রায়শই সেই চরিত্রের অস্তিত্বের সংকটের গভীরে প্রবেশ করেছেন। চরিত্রটির প্রত্যেকটি ক্রিয়া-কর্ম, পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাই লেখক চন্দন আনোয়ার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রায়ণের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন-

> "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ঘটনামুখ্য বা চরিত্রমুখ্য- এই বিতর্ক ওঠার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, তাঁর গল্পে ঘটনা ও চরিত্র দুই-ই সম তাৎপর্যের। তাঁর সময়-সমাজ-ব্যক্তির ক্রম-বিকাশকে গল্পায়িত করতে গিয়ে বিষয়কে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি গুরুত্ব পেয়েছে চরিত্রায়ণ। ...যে বাস্তবতা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়েছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রগুলো সেই জীবন-বাস্তবতারই এক একটি প্রতিমূর্তি। তাঁর চরিত্ররা যেমন এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা, আবার প্রত্যেকেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীরও অংশ।"[৫]

## ৪

কিশোর সাহিত্যেও নারায়ণ্ গঙ্গোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। পটলডাঙ্গার ভজহরি মুখুজ্যে তথা টেনিদা এবং প্যালা, হাবলু ও ক্যাবলা নামে তার তিন সঙ্গী- এই চার মূর্তিকে নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলি শুধু কিশোর নয়, সব বয়সের পাঠকদের মধ্যে প্রাণকাড়া সাড়া জাগিয়েছে। কিশোরদের লেখক হিসেবে 'টেনিদা'-র গল্পগুলি সাফল্যে ও জনপ্রিয়তায় বোধ হয় এখনও তাঁর অন্যান্য রচনাকে পিছনে ফেলে যায়- 'টেনিদার গল্প', 'পটলডাঙ্গার টেনিদা', 'টেনিদা দি গ্রেট', 'টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা', 'ক্রিকেটার টেনিদা', 'টেনিদার কাণ্ডকারখানা (১৯৬৮-১৯৯০)। যদিও টেনিদাদের সামাজিক পরিমণ্ডল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এ দেশ এবং কলকাতা মহানগর থেকে উধাও হতে চলেছে। রকের আড্ডা এবং রাজা-উজির মারাও আর তেমন টিকে নেই। টেনিদারা মূলত নাগরিক কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের ফসল, যেখানে একজন-দুজন ব্যর্থ সন্তানের প্রশ্রয় পাওয়ার পরিসর তৈরি থাকত এবং সেই প্রশ্রয়ের জোরে তাদের আত্মবিশ্বাসও দুর্বল হত না। টেনিদার মধ্যে নেতৃত্বের লোকপ্রসিদ্ধ কোনো গুণ নেই। সে অসম্ভব পেটুক, ভীতুও বটে, বীরত্বের ধারে কাছে সে নেই। তবু সে কেবল মুখের এবং বয়সজনিত দাদাত্বের জোরে সকলের উপর ছড়ি ঘোরায়। তার 'ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফেলিস ইয়াক ইয়াক ম্যাঙ্গো ট্রি ইন ফ্রন্ট অব দি ডোর' এখন প্রবচনের মাহাত্ম্য পেয়েছে। 'টেনিদা'-র গল্পগুলি ছাড়াও লেখকের অন্যান্য কিশোর গল্পগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য- 'সপ্তকাণ্ড', 'হনোলুলুর মাকুদা', 'কম্বল নিরুদ্দেশ', 'পঞ্চাননের হাতী', 'ঘন্টাদার কাবলুকাকা' প্রভৃতি।

বিশেষত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পগুলিতে দিনযাপনের গ্লানি বা সমকালীন যন্ত্রণা কিংবা হতাশা নেই; আছে কেবল নির্মল কৌতুক রস। এছাড়া বিচিত্র নামধারী চরিত্র-গুলিকে তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের গুণে পাঠকের ঔৎসুক্য সঞ্চার করে। গল্পের বুনুনি, ভাষার স্বাভাবিকতা, চরিত্রের অসঙ্গত আচরণ পাঠককে মোহাবিষ্ট করে রাখে। তাই বলতেই হয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার অভূতপূর্ব আবিষ্কার তাঁর কিশোর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের তারাপদ, মৃন্ময়ী, সুভা, ফটিক, শরৎ-সাহিত্যের শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণের অপু, দুর্গা এরা এক জগতের বাসিন্দা। গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় বেড়ে ওঠা এইসব শিশু-কিশোরেরা বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত হলেও প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্য লীলার সঙ্গেই এদের ঘনিষ্ঠতা। এদের রচনাকারের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শ বা তত্ত্ব কোথায় যেন একটা দূরত্ব রচনা করে রেখেছে। অনাবিল আনন্দ, কৌতুক ও দুরন্তপনায় নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সীমারেখায় যেসব অদল বদল ঘটে যাচ্ছে, বুদ্ধি, চাতুর্য, দাদাগিরি কত কিছুর ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছে ভবিষ্যতের নাগরিকরা, স্বদেশ কোথায়

কীভাবে তাদের অস্তিত্বে মিশে যাচ্ছে- এসব পাঠ হয়তো বাঙালি পাঠকদের কাছে অপরিচিতই থেকে যেত যদি না প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার পাশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এসে দাঁড়াত।

**৫**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মূলত কথাসাহিত্যিক রূপেই খ্যাত। কিন্তু তাঁকেও ঘটনাচক্রে নাটক লিখতে হয়েছে। তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যা খুবই সীমিত। তবু সেই সীমিত সংখ্যক নাটকই তাঁর জনপ্রিয়তার মাত্রা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক কোনো গ্রুপ থিয়েটারের দ্বারা স্থায়ীভাবে গৃহীত হয় নি। ফলে বাংলা নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর স্থানটি তেমন সুচিহ্নিত নয়। তাঁর প্রথম নাটক 'রামমোহন' একটি জীবনী নাটক। ১৯৫৯ সালে রচিত এই নাটকে নাট্যকার যুগপ্রবর্তক মণীষী রাজা রামমোহন রায়ের জনহিতৈষী মানসিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এবং সত্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠার প্রতি রামমোহনের আন্তরিকতার পরিচয় এই নাটকের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। 'রামমোহন' নাটকটি একাধিক নাট্যদল অভিনয় করেছে এবং এর একটি চলচ্চিত্র রূপও সংবর্ধিত হয়েছে।

'রামমোহন' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বততই মনে আসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি জীবনী নাটকের নাম- তা হল 'এক সন্ধ্যায়'। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। এই একাঙ্কে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের এক সান্ধ্য বৈঠকের আসরে পরস্পরের মধ্যে কাব্যরসালাপের পটভূমি অঙ্কিত হয়েছে। অন্যদিকে নাট্য-আন্দোলনের বাইরে পারিবারিক এবং সামাজিক নাট্যচর্চার যে একটি বৃহৎ পরিসর রয়েছে, সেখানে নারায়ণবাবুর হাসির নাটকগুলির প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিল, এখনও আছে। সেক্ষেত্রে তাঁর লঘু রসের একাঙ্ক নাটক 'ভাড়াটে চাই' এবং 'বারো ভূত' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'আগন্তুক' নাটকে মার্ক টোয়েইনের একটি গল্পের ছায়া আছে। অভিনব কাহিনির এই নাটকটি জীবন রসিক নাট্যকারের অসাধারণ এক জীবন-জিজ্ঞাসার নাটক।

**৬**

বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে সুবিখ্যাত অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের প্রধান পরিচয় বিশিষ্ট সমালোচক রূপে। সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ছাড়াও এই বিদগ্ধ ও মননশীল লেখক যে-সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাতে তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি ও গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নানান বিষয়ে সমালোচনা গ্রন্থ থাকলেও তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল ছোটোগল্পের প্রতি। মৌলিক সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রেও ছোটোগল্পের প্রতি পক্ষপাত তাঁর। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে তাঁর লেখা তিনটি ছোটোগল্প বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ- 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' এবং 'ছোটগল্পের সীমারেখা'।

'সাহিত্যে ছোটোগল্প' গ্রন্থটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটোগল্প সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থ। গল্পের প্রতি তাঁর আজন্ম ঔৎসুক্য থেকে উঠে এলো গ্রন্থের বিষয়। এর আগে ছোটোগল্পের উদ্ভব ইত্যাদি সম্পর্কে বাংলায় আর কোনো আলোচনা গ্রন্থ হয় নি। সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষত ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক আলোচনাও যে বাংলায় করা যায়, তা নারায়ণ গমগোপাধায়ই প্রথম করে দেখালেন। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ তিনিই। ছোটোগল্প-সাহিত্যের প্রেরণা, তত্ত্ব ও রূপ বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে এখানে ছোটোগল্পের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা সর্বজন বিদিত-

> "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৬]

'বাংলা গল্প বিচিত্রা' গ্রন্থটিতে নারায়ণবাবু বাংলা ছোটোগল্পের বৈভব, বর্ণিল বৈচিত্র্য তুলে ধরলেন। সাতজন বিশিষ্ট লেখকের গল্পের প্রেক্ষিতে বাংলা গল্পের বৈচিত্র্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করালেন। এই সাতজন বিশিষ্ট লেখক হলেন- ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লেখকদের গল্পকৃতির আলোচনায় খুব স্পষ্ট ভাবেই চিহ্নিত করেছেন তাঁদের গল্প বলার ভঙ্গি, লেখকদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সূত্রাকারে তুলে ধরেছেন প্রত্যেকের নিজস্বতাকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের ছোটগল্প বিষয়ক তৃতীয় এবং সর্বশেষ গ্রন্থ 'ছোটগল্পের সীমারেখা'। ছোটোগল্পকে লেখক যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে-

> "ছোটগল্প গড়ে উঠেছে দুটি জিনিসের মিশ্রনে। লেখকের নিজস্ব একটি জগৎ-জীবন মানববোধ আছেই- profound হোক আর না-ই হোক, তা-ই হল তাঁর দর্শন। আর জীবন থেকে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী যেসব উপকরণ তিনি আহরণ করে নিচ্ছেন, তারা সেই দর্শনের দ্বারা বিরঞ্জিত হয়ে, শিল্প হয়ে উঠেছে। তাই একালের ভালো গল্প কেবল কৌতূহল সৃষ্টির জন্যে ঘটনা নির্মান করছে না, কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রচারের জন্য গল্পকে বাহন করছে না (বক্তব্য তো লেখকের জীবন-দৃষ্টি থেকে স্বয়ং প্রকটিত হবে), আসলে তার একটি মাত্র প্রবণতা, তা বস্তুনির্ভর হয়েও বাস্তবাতীত, তা দূরাচারী, তা প্রতীকী।"[৭]

অর্থাৎ লেখকের মনোভূমি ও ছোটোগল্পের প্রতীকধর্মির্তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর গল্পের মধ্যেও এ দুটি দিক প্রত্যক্ষগোচর।

উক্ত তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও লেখকের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি বাংলা প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। বাস্তববাদী মানুষের মধ্যেও তো স্বপ্ন ঘুমিয়ে থাকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য পাঠে সেই স্বপ্নই খুঁজে বেড়ান। তাঁর গল্প বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে পাঠকের মধ্যে স্বপ্নই চারিয়ে যায়। রিয়ালিস্টিক সাহিত্যে থেকেও পাঠক খুঁজে পায় আশার আলো, সাহিত্যের প্রাণ। আপাতভাবে ভাঙার গল্পে গড়ার ইঙ্গিত পেয়ে যায়। তাঁর আলোচনার অনুসরণে, তাঁর হাত ধরে সাহিত্যে-ছোটোগল্পে পাঠক প্রাণের স্পর্শ পেয়ে যায়। সাহিত্যের প্রাণের স্পর্শে তাঁর সমালোচনাগুলি প্রাণোজ্জ্বল-প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছন্দ গঠন এবং সংহত গদ্যশৈলীর গুণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মননশীল আলোচনা-সমালোচনাগুলিও সপ্রাণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

**৭**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তো বটেই, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সুচিত্র নাট্যকার। কাজেই তাঁর লেখা সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ হবে না, এটা হতেই পারে না। ভজহরি মূখার্জী, স্বর্ণেন্দু সেন, কুশল মিত্র, কমলেশ ব্যানার্জী- এই চারটি নাম আসলে টেনিদা, হাবলু, ক্যাবলা ও প্যালারামের ভালো নাম। সেই চার ইয়ারির নানান অভিযান ও কাণ্ডকারখানা সম্বলিত 'টেনিদার গল্প' নিয়ে নির্মিত হল 'চারমূর্তি' ছবিটি। কাহিনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে এক চিত্রনাট্য লিখলেন পরিচালক উমানাথ ভট্টাচার্য। ছোটোদের উপভোগ্য এই ছবিটি বিশেষ জনপ্রিয়। ১৯৬২ সালে সুশীল মজুমদার নারায়ণবাবুর 'সঞ্চারিণী' কাহিনির চিত্ররূপ দিলেন। তাঁর 'বনজ্যোৎস্না' কাহিনির চিত্ররূপ দিলেন পরিচালক দীনেন গুপ্ত। 'নন্দিতা' কাহিনির চিত্ররূপ দিলেন পরিচালক স্বদেশ সরকার। ২০১৭ সালে পাওয়া গেল 'টোপ' গল্পের চিত্ররূপ। লেখকের এই সুবিখ্যাত গল্পের চলচ্চিত্রায়ণের জন্য এগিয়ে এলেন প্রখ্যাত পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

লেখকের গল্প-উপন্যাস নিয়ে ছবি হয়েছে যেমন, তেমনি ছবির জন্য তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও চিত্রনাট্য লিখেছেন। এই কাজে তিনি কতটা পারদর্শী ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায় 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবি থেকে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে নারায়ণবাবু এই ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছিলেন। তারপর একে একে 'পূর্বরাগ', 'ইন্দিরা', 'সীমান্তিক', 'রূপান্তর', 'সংকেত', 'সম্পদ', 'কপালকুণ্ডলা', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি ছবিগুলির চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে 'কমললতা' ছবিটি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত 'কমললতা' ছবির কাহিনি বিন্যাস, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায় নারায়ণবাবু অতুলনীয় কাজ করেছেন।

**৮**

'সুনন্দর জার্নাল'-এর শেষের দিকের একটি লেখাতে সুনন্দ লিখেছেন- "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় 'সুনন্দের পাতাটি যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল"। এই মন্তব্যটি থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। সাধারণের, মূলত সাধারণ শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকেই সমকালকে দেখতে চেয়েছেন এবং সমসময়ের কমনম্যানের অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন জার্নালের মধ্যে। ১৯৬৪ সাল -১৯৭০ সাল, প্রতি সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হত 'সুনন্দর জার্নাল'। 'দেশ' পত্রিকায় সম্পাদক সাগরময় ঘোষ স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'সুনন্দ' ছদ্মনামটি দিয়েছিলেন। একটানা বেশ কয়েক বছর বাঙালি পাঠককে আনন্দ দিয়ে গেছে সুনন্দর লেখাগুলি। তবে নারায়ণবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে এই লেখায় ছেদ পড়ে।

জার্নালটির বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র। এখানে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তার কর্মবিমুখ মানসিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত প্রিয়তা, বাহাদুরি নেবার মেকি মানসিকতা, অব্যবস্থিত শিক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বাঙালির সংযোগ ও তার জীবনের উত্থান-পতন, আশা-নিরাশার দোলাচলতা, দেশি-বিদেশি লেখকের শতবার্ষিকী, খ্যাতনামা লেখক ও বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিদের তিরোধানে জাতির বেদনা এবং এই জার্নালের কথক ও স্রষ্টা সুনন্দর সমবেদনা। প্রকৃত অর্থে এই জার্নাল গ্রন্থটি একাধারে এই সময়ের প্রবাহ পথে বাঙালির জীবনেতিহাস ও সমাজের চলচ্ছবি। সেই সঙ্গে এখানে সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অসঙ্গতিগুলিকে সমালোচনার প্রশ্নে শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুন মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত কমনম্যানের নক্সা জাতীয় চালচিত্রে ফুটে উঠেছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখ ও মুখোশের বর্ণময় রূপ। টেকচাঁদ, হুতোম, কমলাকান্তের হাত ধরে পরাধীন দেশে নাগরিক বাবু ও বিদেশি শাসকের যে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকার সূচনা হয়েছিল, সুনন্দ তারই এক ভিন্ন রূপ। সুনন্দের কমনম্যান ছদ্মবেশের আড়ালে একটা তীক্ষ্ণ চোখ ছিন্নভিন্ন করে দেখে যাচ্ছিল শিক্ষিত বাঙালির অন্তঃসারশূন্য ভিত্তি হীন মূঢ় অহংকারের নির্বুদ্ধিতাকে। বাঙালি পাঠক আজও অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে না সুনন্দের জার্নালের আকস্মিক অপমৃত্যু।

'সুনন্দর জার্নাল'-এ কমনম্যানের মধ্যে অভিঘাত তৈরি করে এমন কোনো ঘটনাই বাদ পড়েনি সুনন্দর কলমে। বস্তুত, সুনন্দ এখানে বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে সমাজ বীক্ষণের চেষ্টায় রত ছিলেন। সেই দিক থেকে জার্নালটির সামাজিক মূল্য আছে।

দীর্ঘ এই প্রবন্ধের পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থান কোথায়, তাঁর রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী এবং তাঁর স্বতন্ত্রতাই বা কতটুকু-উপরিউক্ত আলোচনায় তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত তাঁর প্রতিভা কালের পৃষ্ঠায় নিজস্ব স্বাক্ষর উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত করে তুলেছে। তাই বলতেই হয়, বিংশ শতক অতিক্রম করে একবিংশ শতকেও প্রতিভাবান্বিত এই নক্ষত্রটি পাঠক চিত্তে স্বমহিমায় বিরাজমান হয়ে ছিলেন, আছেন এবং আবহমানকাল থাকবেন।

**তথ্যসূত্র :**

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, সপ্তম সংস্করণঃ ১৯৮৪, পৃ. ৩৩৬
২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পঞ্চম সংস্করণঃ মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৫৫, ১৫৬
৩. রায় অলোক, বাংলা উপন্যাসঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭ ০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০০, পৃ. ১৫৪, ১৫৫
৪. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০

০৭৩, চতুর্থ সংস্করণঃ আশ্বিন ১৪১৮, সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ. ৩৮৮

৫. পুরকাইত উত্তম, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪২১, উজাগর প্রকাশন, শিবানন্দধাম, সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পৃ. ২০৬

৬. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণঃ শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ১৭৩

৭. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, ছোটগল্পের সীমারেখা, প্রকাশ ভবন, ১৮/৩, সল্ট লেক বাইপাস, বিধাননগর, কলকাতা, ৭০০০৬৪, প্রথম প্রকাশঃ ফাল্গুন ১৩৭৬, মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ৪৫